দৈনিক সংবাদ

21

তারিখ ... SEP 04 1999 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

'ঝরে পড়ছে ৪০ ভাগ স্কুলেই যায় না ১০ ভাগ'

আজকাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বেড়েছে। কিন্তু ভর্তি অনেক হলেও ছাত্ররা সেখানে থাকছে কম। প্রাথমিক পর্ব শেষ না করেই স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হার শতকরা ত্রিশ থেকে চল্লিশ। এর উপর রয়েছে আরো শতকরা দশজন যারা স্কুলে আদৌ ভর্তিই হয় না। এ অবস্থাতেই এসব ছেলেমেয়ে তাদের কৈশোরে প্রবেশ করে। বিদ্যালয়ে যাওবা শিক্ষা তারা অর্জন করেছিল, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা ধরে রাখা সম্ভব হয় না। জীবিকার সংগ্রামে এ বয়সেই জড়িত হয়ে শিক্ষার মাধ্যমে নিজেকে গড়ার সুযোগ সাধারণত এদের জীবনে আর আসে না।

সম্প্রতি বি আই এম মিলনায়তনে সেন্টার ফর ম্যাস এডুকেশন ইন সায়েন্স (সি এম ই এস) আয়োজিত সেমিনারে এ উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

সেমিনারের শুরুর অধিবেশনটি ছিল ভর্তি না হওয়া আর ঝরে পড়ার সমস্যার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ। দ্বিতীয় অধিবেশনটি ছিল এসব কিশোর-কিশোরীর জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার কি কি সুযোগ রয়েছে সে বিষয়ে। শেষ অধিবেশনটি ছিল তাদের জীবনসংগ্রাম বাস্তবতার সঙ্গে শিক্ষাকে কিভাবে সমন্বিত করা যায় তাই নিয়ে। অধিবেশনগুলোতে সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সচিব ডঃ সা'দত হুসাইন, গণসাক্ষরতা অভিযানের উপদেষ্টা আ ন ম ইউসুফ এবং ঢাকা আহ্‌সানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক, কাজী রফিকুল আলম।

শুরুতে সেমিনারের পটভূমি উপস্থাপন করেন আয়োজক সি,এম,ই,এস-এর নির্বাহী পরিচালক ডঃ মুহাম্মদ ইব্রাহীম। তিনি বলেন, স্কুলের সংখ্যা বাড়লেই, এমনকি স্কুলের মান উন্নত হলেই ঝরে পড়ার সমস্যাটি শেষ হয়ে যায় না। কারণ সমস্যার উৎপত্তি দারিদ্র্যের মধ্যে। অনেক পরিবারে কৈশোরের আগ থেকে ছেলে বা

ঝরে ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৫

ঝরে ঃ পড়ছে ৪০ ভাগ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মেয়ে আয়মূলক কাজ পরিবারের জন্য আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। অন্তত বাবা বা মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ না করলে তাদের দিন চলে না। জীবন সংগ্রামের এই দিকটির কথা বিবেচনায় না রেখে ঝরে পড়া কিশোর-কিশোরীদের শিক্ষা-সমস্যাকে ভাবা যায় না। একে তথাকথিত বয়স্ক শিক্ষা বা সাক্ষরতা অভিযানের সঙ্গে এক করে দেখলেও চলবে না। প্রাথমিক এবং সম্ভব ক্ষেত্রে মাধ্যমিকের সমমানের শিক্ষার মধ্যে তাকে নিয়ে যেতে হবে। শিক্ষার একটি দ্বিতীয় সুযোগ এমনভাবে তাদের দিতে হবে যাতে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের আয়-উন্নতিতেও তা কাজে লাগে। প্রযুক্তিকে, জীবন সংগ্রাম দক্ষতাগুলোকে শিক্ষার সঙ্গে একীভূত করে নিলেই এটি সম্ভব হবে। ঝরে পড়া সকল কিশোর-কিশোরীর চাহিদা এক রকম নয়, এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রয়োজনে বিভিন্নমুখী করে কিছুটা নমনীয়ভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করা চাই। জীবনের কাজ, শিক্ষার সঙ্গে চললে তবেই তারা এই দ্বিতীয় সুযোগ নিতে পারে। এতে জটিলতা হয়তো বাড়ে, কিন্তু সমস্যাটিই যে জটিল, এক্ষেত্রে অপ্রচলিত ব্যবস্থা উদ্ভাবনমূলক ব্যবস্থা নেয়া ছাড়া উপায় নেই।

শিক্ষা সম্পর্কিত গবেষক বি আই ডি এস-এর ডঃ মাহমুদুল আলম ঝরে পড়ার বিষয়টি সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসেবে মাধ্যমে তুলে ধরে কয়েকটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য ইত্যাদি আকর্ষণ সৃষ্টি করে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বাড়ানো সম্ভব হলেও সেখানে শিক্ষা অর্জনের মানে উন্নতি আসেনি। ফলে যারা ভর্তি হয় তাদের একটি বড় অংশ ঝরে পড়ে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক খন্দকার শহীদুল ইসলাম কিশোর-কিশোরীরা বিদ্যালয় থেকে কেন ঝরে পড়ছে তার বিভিন্নমুখী কারণের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তার মতে কর্ম সংস্থানের বাজারে শিক্ষার মূল্যটি স্পষ্ট না হবার মধ্যে এর কারণ নিহিত রয়েছে। এজন্য ঝরে পড়া কিশোর-কিশোরীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হলে এমন সব সক্ষমতাও এর সঙ্গে যোগ করতে হবে যেগুলো তাকে স্বল্পদিনের মধ্যে জীবন সংগ্রামের সহায়তা দিতে পারবে— কারিগরী কিছু দক্ষতা এ ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখবে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের মহাপরিচালক ডঃ মোঃ আনোয়ারুল হক গুরুত্ব দেন ঝরে পড়া বন্ধ করার জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচেষ্টার মধ্যে যে সব কর্মকৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে— তার উপর। ছাত্র শিক্ষকের অনুপাত বাড়ানো, শিক্ষার সময় বাড়ানো, শিফটের প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে ফেলা— ইত্যাদি প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিক্ষার মানে উন্নতি আসলে ঝরে পড়ার প্রবণতা কমবে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি এক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার সাফল্য অনেকটা নির্ভর করবে এর সঙ্গে স্থানীয় সমাজকে আমরা আবার কতখানি সম্পৃক্ত করতে পারছি এর উপর।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সচিব ডঃ সাদত হুসাইন বলেন, সরকারকে অনেক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। যেমন প্রতিবছর শুধু নদী ভাঙনেই ১০০টির মত প্রাথমিক বিদ্যালয় তলিয়ে যায়। তা সত্ত্বেও ভর্তি অনেক বেড়েছে, ঝরে পড়ার হারও ক্রমে কমছে— শতকরা ৪০ ভাগ থেকে এখন ৩২ ভাগে নেমে এসেছে। শিক্ষকরা অনুপস্থিত যে থাকেন তা নয়, তবে তারা পূর্ণ সময় বিদ্যালয়ে দেন না। ছাত্রদের উপস্থিতি সন্তোষজনক নয়। সমস্যার অনেকখানিই অর্থনৈতিক এবং কিছুটা আমাদের সংস্কৃতিতেও পরিণত হয়েছে। বহু রকমের অজুহাতেই বিদ্যালয়ের কাজ ব্যাহত হয়ে থাকে কথায় কথায়— আজ বাজারের দিন, কাল বৃষ্টি, পরশু প্রদর্শনী ইত্যাদি।

ডঃ সাদত বলেন, যেভাবে বলা হয়, বিদ্যালয় সেই অর্থে একটি আকর্ষণীয় মজার জায়গা হতে পারে না, বরং এতে লেখাপড়ার চাপ থাকে। ছাত্ররা বিদ্যালয় ছুটি থাকলেই খুশি হয়— চিরকালই তাই হয়েছে। পরিবার ও সমাজের কাছ থেকে একটি তাগিদ না থাকলে অনীহার সমস্যার সমাধান হবে না। বিদ্যালয়ের কার্যক্রমকে নমনীয় করার কথা বলা হয়। কিন্তু আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকে এরকম নমনীয় করা যায় না— তা হলে শিক্ষা হবে না, ফাঁকি বাড়বে।

সেমিনারে স্কুল ঝরে পড়া কিশোর-কিশোরীদের জীবনাশ্রয়ী শিক্ষার জন্য সিএমইএস প্রবর্তিত মৌলিক বিদ্যালয় ব্যবস্থার গত দুই দশকের অভিজ্ঞতার বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়। বিভিন্ন অধিবেশনে তিনটি উপস্থাপনার মাধ্যমে এটি তুলে ধরেন হাসান বানু, শার্মিন ফরহাত এবং হাদিউজ্জামান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি